অন্তহীন দুস্বপ্নঃ ২৫ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল, ১৯৭১

‘করোনা আক্রান্ত পৃথিবীতে’ এখন যেমন প্রতিনিয়ত মনে হয়’ এই লক-ডাউন, এই ‘অন্তহীন দুঃস্বপ্ন’ আদৌ কি শেষ হবে, কবে শেষ হবে! ঠিক এখনকার মত’ সেই রাতেও মনে হচ্ছিল, এই কালো রাত কি কোন দিন শেষ হবে! ২৫ মার্চ, ১৯৭১’ যারা সেই রাতে ঢাকা শহরে ছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া বাকী সবার কাছেই জীবনের দীর্ঘতম রাত ছিল সেই অভিশপ্ত ২৫ মার্চ। সেই রাত ছিল’ গুলি, আগুন আর আর্তনাদের।

এক সময় গুলির আওয়াজের মধ্যে ভোর হল। আমরা তখন যেহেতু সাইন্স ল্যাবরেটরী স্টাফ কোয়ার্টারের পিছনের বিল্ডিং’এ (এ-৩) থাকতাম তাই আমাদের বাসা থেকে নিউ এলিফেন্ট বা এলিফেন্ট রোড দেখা যেত না এবং সরাসরি গুলি আসার সম্ভাবনাও কম ছিল। আব্বা ২৩ মার্চ এ আমার কেনা ‘স্বাধীন বাংলা’র পতাকা’ গুলির মধ্যেই বাসার কার্নিশ থেকে খুলে নিয়ে আসলেন। আমাদের মধ্যে এক অজানা আতংক ভর করল। রেডিও’তে কিছুক্ষন পর পর কার্ফিউ ঘোষনার সাথে সাথে’ ‘এক জরুরী এলান’ বলে উর্দু ঘোষনা। আমরাও জানতাম না যে, সেটা ছিল ‘শেষের শুরু’ বা বিগিনিং অফ ত্য এন্ড!

২৬ মার্চ সকাল দশটার দিকে কারফিউ’র মধ্যেও আমরা জানতে পারলাম যে নিউ এলিফেন্ট রোড এ অবস্থিত গুলবাগ মসজিদ এ ফজর নামাজ পরতে আসা আমাদের পরিচিত এক মুসল্লী (যিনি ঘড়ি’র মেকানিক ছিলেন) পাকিস্তানী সেনাদের গুলিতে মসজিদের মধ্যে শহীদ হন আর ল্যাবরেটরী রোড এ অবস্থিত জনাব এ, আর ভুইয়া (মরহুম কালা ফারুক ভাইয়ের বাবা এবং পরবর্তীতে অগ্রনী ব্যাংকের এম, ডি) সাহেবের বাসায় পাকিস্থানী সেনারা হামলা করে বাসা গুলি করে তছনছ করে দিয়েছে। জনাব এ, আর ভুইয়া বঙ্গবন্ধু’র ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। বিকালের দিকে আরো জানতে পারি যে নিউ এলিফেন্ট রোড এ অবস্থিত লন্ডন ইলেক্ট্রনিক্সের পাশের বাসায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াযযেম হোসেন’কে হত্যা করেছে পাকিস্তানী হানাদাররা। সব বস্তী পুড়িয়ে দিয়েছে। চারিদিকে শুধু মৃত্যু আর আতঙ্কের সংবাদ। আমাদের বাসায় কাজ করতেন নুরী’র মা, থাকতেন কাটাবন বস্তীতে সপরিবারে। সেই পরিবারের সবার জন্য আমাদের খুব চিন্তা হতে লাগল।

পরদিন ২৭ মার্চ, কয়েক ঘন্টার জন্য কার্ফিউ তুলে নেয়া হলে আব্বা আর ছোট্মামা (চাঁদপুর থেকে আসা) বের হলেন কি ঘটেছে তা বিস্তারিত জানার জন্য। শুনলাম ইউনিভার্সিটি এলাকা, সদর ঘাট আর নিউ মার্কেট এলাকায় প্রচন্ড হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল ২৫ মার্চ রাতে। পরের কয়েকদিন কাটল আরো দুঃসংবাদ শুনে। আমাদের ইউ ল্যাব স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল সাদেক স্যার’কেও পাকিস্তানী বর্বররা হত্যা করেছিল ভার্সিটির শিক্ষকদের সাথে। আর জগন্নাথ আর ইকবাল (বর্তমানে জহুরুল হক) হলেও করেছে পাইকারী হত্যা। সেই সময় বুয়েটের শিক্ষক নুরুল উলা স্যার জীবনের ঝুকি নিয়ে জগন্নাথের গনহত্যা মুভি ক্যামেরাতে ধারন করেছিলেন, যা এখনও ইউ টিউব’এ দেখা যায়।

এক একটা দিন আর শেষ হতে চায় না। আমাদের এক এক সময় মনে হত, এই অন্তহীন দুঃস্বপ্ন বোধহয় আর কোন দিনই শেষ হবে না। আমরা তখনও জানতাম না ২৫ এর প্রথম প্রহরে রাজার বাগের পুলিশদের থ্রী নট থ্রী’ দিয়ে পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক’এর বিরূদ্ধে অকল্পনীয় প্রতিরোধ, আর ই পি আর এর বাঙ্গালী জোয়ানদের যুদ্ধের কথা। এই ভাবেই বন্দীদশায় শেষ হলো ১৯৭১ এর মার্চের শেষ সপ্তাহ।

জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি (বিশেষত বয়স্কদের জন্য) যখন ঢাকায় থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল,তখন এপ্রিলের ১ তারিখে আমরা (সাথে আমার বন্ধু দুলাল (৩ লং কোর্স'এর এবং পরবর্তীতে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্সের কর্নেল সালাম)-বাদল'দের পরিবার এক সাথে মিটফোর্ড হসপিটাল এর পাশে সোয়ারী ঘাট দিয়ে বুড়ীগংগা পার হয়ে, কেরানীগঞ্জের শুভাড্যা-জিঞ্জিরার মধ্য দিয়ে ১৪-১৫ মাইল পথ পায়ে হেঁটে রাত্রে মুন্সীগঞ্জ শহরে আমাদের বাসার উপর তলার বন্ধু হাসান (এ ৪) এর নানা জুলফে মোক্তার সাহের (মোহমেডান এবং জাতীয় ফুটবল দলের সদস্য নওশের এবং শরীফ এর বাবা) এর বাসায় আশ্রয় নেই। রাস্তায় আমাদের মত ঢাকা থেকে পালানো হাজার-হাজার মানুষ ছিল। সবাই শেল-শক'এ স্তব্ধ, কারো মুখে কোন কথা নাই, সবার গন্তব্য ঢাকা থেকে যত-দুরে যাওয়া যায়!
জিঞ্জিরাবাসী'রা সেই দিনগুলিতে ঢাকা থেকে পালানো এই সব মানুষের দিকে তাদের সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। পথে পথে পানি, মুড়ি আর সিদ্ধ আলু নিয়ে বসে থাকত! এর প্রতিশোধ হিসাবে 'আমরা যাওয়ার পরদিন'ই পাকিস্তানী বাহিনী জিঞ্জিরায় চালায় প্রচন্ড ধ্বংসযজ্ঞ আর গনহত্যা। আমরা কপালগুনে সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে যাই। অনেক বছর পর বই পড়ে জানতে পারি যে, কবি নির্মলেন্দু গুন'ও সেই দিন জিঞ্জিরায় এক খড়ের গাঁদায় লুকিয়ে প্রান বাচান।

পরদিন সকালে মুন্সীগঞ্জের হরগংগা কলেজ পার হয়ে কাটাখালি নামক স্থান থেকে ভাগ্যক্রমে একটি দূর্লভ খুবই ছোট স্পীড বোট (দশ-বার জন বসার মত) ভাড়া করে আমরা দুই পরিবার একত্রে চাঁদপুর রওয়ানা হই। আমরা যখন চাদপুর থেকে ৫-৬ মাইল উজানে তখন প্রমত্তা মেঘনার ঢেউয়ে আমাদের ছোট্ট স্পীড বোট'এ পানি উঠতে উঠতে একসময় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। বড়রা সবাই চিৎকার করে দোয়া-কালাম পড়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের মনে হচ্ছিল যে জীবন বাচাতে ঢাকা ছেড়ে এসে শেষ পর্যন্ত মেঘনায় ডূবে মরতে হবে আমাদের। ঠিক এমন সময় স্পীড বোটের প্রপেলার মাছ ধরার জালে জড়িয়ে গেলে মনে হয়, সব শেষ! আমাদের জীবন মাছ বোধহয় ধরার জালেই আটকা পড়ল! জাল ছাড়ানোর পর স্পীড বোট'এর চালক পাশের এক খালে লঞ্চটি ঢুকিয়ে দিলে অলৌকিকভাবে আমাদের জীবন বেঁচে যায়! এর ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমরা চাঁদপুর'এ পৌছে হতভম্ভ হয়ে যাই! সমগ্র চাঁদপুর' স্বাধীন বাংলা'র পতাকায় ছেয়ে আছে। তখন আমরা বুঝতে পারি, চাঁদপুর এখনও স্বাধীন। আমাদের অন্তহীন আতংক, হতাশা'র বোধহয় শেষ হল। এলাকার মানুষদের কথাবার্তায় বুঝা গেল, ঢাকার ঘটনাবলি এবং হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে চাঁদপুর'এর লোকজন এর তেমন কোন ধারনাই নাই।

সপ্তাখানেক'এর মধ্যে চাঁদপুর শহর পাকিস্তানী হানাদারদের দখলে আসে। এবার আমাদের আবার যাত্রা শুরু হয়, এইবার গ্রামের দিকে। আমরা চাঁদপুর শহর থেকে ১৫-২০ মাইল দূরে আমার খালাদের গ্রাম শেখদী'তে আশ্রয় নেই। ডাকাতিয়া নদীর পাশে ছোট্টগ্রাম। বাগড়া বাজার থেকে প্রায় ৩ -৪ মাইল হেটে যেতে হয় সেই গ্রামে। আমার খালাদের গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে দেখি আমার খালাত ভাইদের' জ্যাঠাত ভাইরাও জীবন বাচাতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের সবচেয়ে বড় ভাই ডাক্তার সোলায়মান খান (দুদু ভাই) আর তার ছোট বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হাশেম খান (মধু ভাই)। বডি-বিল্ডার এর মত দেখতে ডাক্তার সোলায়মান খান ছিলেন নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি'র সদস্য এবং গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান সম্পন্ন।

ডাক্তার সোলায়মান খানএর ছিল দাবা খেলার শখ। আমিও বয়সের তুলনায় বেশ ভাল দাবা খেলতাম। তাই প্রতিদিন বিকেল বেল আমাদের মধ্যে দাবা খেলা হত। আব্বা এদিকে ঢাকা ফিরে যান এবং কয়েকদিন পরই একব্যান্ডের ফিলিপ্স রেডিও পাঠিয়ে দেন আব্দুল হাই ভাই'এর মাধ্যমে। আমাদের

কাজ ছিল দিনে বড়'দের কথা গেলা আর রাতে ঘুমানোর আগে সেই রেডিওতে আকাশবানী আর বিবিসি'র খবর শুনা। তখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হয় নাই। এরই মধ্যে এদিক ওদিক থেকে খবর আসা শুরু হল যে দুরের গ্রামগুলি'তে মাঝে মধ্যে ডাকাতি হচ্ছে। তাই রাত হলেই আমরা কিছুটা হলেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পরতাম। রাত্রের খাওয়া শেষ করে বিবিসি' আর আকাশবানী'র খবরের পর প্রথমে ফু দিয়ে হারিকেন নিভিয়ে দেওয়ার পর' আয়াতুল কুরসী আর দোয়া ইউনুস পরে বুকে ফু দেওয়া নিয়মিত অভ্যাসে পরিনত হল।

২৫ এপ্রিল দিনটাও ছিল অন্য দিনগুলির মত, সোলায়মান খান (দুদু ভাই) আর হাশেম খান (মধু ভাই) আমদের ঘরে এসেছিলেন ফিলিপস রেডিও'তে বিবিসি আর আকাশবানী'র খবর শুনতে। রাত্রে বিবিসি আর আকাশবানী শুনে আমরা আয়াতুল কুরসী আর দোয়া ইউনুস পরে বুকে ফু দিতে দিতে ঘুমিয়ে গেলাম।

হটাত দরজা ভাঙ্গার আওয়াজে চোখ খুলে দেখি ঘরের মধ্যে ডাকাত। আমার থেক এক ফিট এর মত দূরে বন্দুক বা থ্রি নট থ্রি তাক করা আর চোখের উপর পাওয়ারফুল টর্চ-লাইট'এর আলো। গামছা দিয়ে সবার মুখ পেচানো। আমার খুব ছোট বেলা থেকেই বিপদে পড়া এবং বিপদের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় কথা বলে বিপদ থেকে পরিত্রান পাওয়্যার সহজাত প্রবৃত্তি ছিল। আমি ঘুম থেকে উঠে চোখ ডলতে ডলতে বলেছিলাম, 'আমরা ঢাকা থেকে পালাইয়া আসছি, আমরা কিছু আনতে পারি নাই'। ডাকাত'রা আমার কথা বিশ্বাস করে, ফিলিপস রেডিওটা বগলদাবা করে আমাদের ঘর থেকে বের হয়ে গেল আর যাওয়ার সময় বলল, 'চিল্লাচিল্লি করতে 'গুলি কইরা সবাইরে মাইরা ফালামু'।

আমাদের ঘরে ডাকাতি শেষ করে ডাকাত'রা গেল আমার খালাত ভাইদের জ্যাঠার ঘরে। পুকুরের ঘাটলা থেকে আনা' তাল গাছের গুড়ি দিয়ে কয়েকবার আঘাত করার পর দরজা ভেঙ্গে গেল। আমরা দরজা ভাঙ্গার শব্দের সাথে সাথে শুনতে পেলাম মহিলাদের কান্নার আওয়াজ। তার কয়েক মিনিট পরেই শুনলাম গুলির আওয়াজ আর প্রচন্ড হইচই। গুলির আওয়াজে গ্রামের লোকজন জেগে উঠল, আর ডাকাতদল'ও তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে গেল।

বেশ কতক্ষন পর আমরা বের হয়ে দেখলাম, ডাক্তার সোলায়মান খান (দুদু ভাই) এর অবস্থা খুবই খারাপ, বুকের মধ্য দিয়ে গুলি ঢুকে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে গ্যাছে আর তার ছোট বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হাশেম খান (মধু ভাই) এর পায়ের কাফ মাসেল'এ গুলি লেগেছে। আর বাড়ির অন্য দুই জন সামান্য আহত। এরই মধ্যে গ্রাম ভেঙ্গে লোকজন আসা শুরু করেছে। জানাজার খাটে করে ডাক্তার সোলায়মান খান'কে চিকিৎসার জন্য চাঁদপুর শহরের দিকে লোকজন রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু কয়েক ঘন্টা-খানেক বাদেই সোলায়মান খান মারা যান এবং তার মৃত দেহ নিয়ে সবাই ফিরে আসে।

সেই প্রথম আমি খুব কাছে থেকে একজন মানুষের মৃত্যু প্রতক্ষ্য করি। সারা বাড়িতে অস্বাভাবিক রকম নিস্তব্ধতা, মৃত্যুর ঘ্রান আর আতর বাতির গন্ধ মিলে এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। সোলায়মান খান'এর মরদেহে'র পাশে বসে আমি ভাবছিলাম এই দুঃস্বপ্ন কি শেষ হবে না! তার কয়েকদিন পরই আমরা চাঁদপুর শহরে চলে আসি।

১৯৬৫ সাকের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ছড়ানো উগ্র-সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠা আমার মনে প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানী'রা তো আমাদের মতোই মুসলমান আর এই ডাকাত'রা তো আমাদের এলাকার মুসলমান, কিন্তু তাদের হাত থেকে প্রান বাঁচানোর জন্যা আমরা আজ কেন পালিয়ে

বেড়াচ্ছি? এই একমাসের ঘটনার মধ্যেই আমি সম্পূর্নভাবে আঞ্চলিকতা আর সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত হয়ে যাই এবং সেই থেকে আঞ্চলিকতা আর সাম্প্রদায়িকতা'কে মনে প্রানে ঘৃনা করি।

সেই দুঃস্বপ্নের সময়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আর বাংলাদেশ তার অস্তিত্বের জন্য লড়ছিল। কয়েকটি বন্ধু রাষ্ট্র ব্যাতীত কেউ আমাদের পাশে ছিল না। তারপরও এক সময় বাংলাদেশ মৃত্যপুরী থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের অন্তহীন দুঃস্বপ্নের শেষ হয় । তারপরও আমরা জয়ী হয়েছিলাম, কারন আমাদের সামনে আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না।

আর আজকে, করোনা'র বিরূদ্ধে সমগ্র বিশ্ব এবং মানব-সমাজ একই কাতারে লড়ছে। সমগ্র বিশ্বের স্বাস্থ্য, যোগাযোগ আর অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে। করোনাকে পরাস্থ করা ব্যাতীত আর কোন পথ খোলা নাই বিশ্ববাসীর সামনে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান, সম্পদ, মেধা আজ একই সাথে কাজ করছে করোনা মোকাবিলায়। তাই এই দুঃস্বপ্নের দিন শেষ হতে বাধ্য এবং দ্রুতই শেষ হবে।

নাজমুল আহসান শেখ